ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 141-147
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.443

বনফুলের গল্প বিশ্বে নারীর অবস্থান অন্বেষণ- নির্বাচিত গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

ভাগ্যশ্রী তালুকদার, *গবেষক, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstact

Banaphul wad an amazing writer of his time. Many of his stories highlighted the situation of women of twentieth century whose voice often suppressed by the society. He portrayed women who are otherwise treated as invisible by the Society. His small stories ended with sharp twist often revealed woman's true inner state. In India, conservative societal norms play a very critical role in determining the destiny of a woman especially in twentieth century. Banaphul used his scientific background as a doctor to observe and present women with clinical precision and deep psychological insight. His work frequently explores the complexities, absurdities, and hidden aspects of human character. Here in this article, we would like to identify the situation, the voice of women of that time.

Keywords: women, Banaphul, society, Twentieth century, situation

প্রবহমান সময় তার করস্পর্শ রেখে যায় সাহিত্যের পাতায়। তাই সমাজমনের হদিশ পেতে আমাদের বারবার ফিরে আসা সাহিত্যের কাছে। যদিও যুগগত ইতিহাস সংরক্ষণ সাহিত্যিকের দায়িত্ব নয়। তিনি বলে চলেন মানুষের কথা। সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে আত্মপ্রকাশের তাগিদ মানুষকে ব্যাকুল করেছে। তার বিচিত্র উপলব্ধি আর অনুভূতির জগৎকে কখনো শব্দ, কখনো চিত্রে, আবার কখনো বা ভিন্নতর কোন মাধ্যমে সে প্রকাশ করতে চেয়েছে। অনুভূতির এই ব্যক্তিক প্রকাশ কিন্তু সর্বদাই বহুমানুষের উপলব্ধিকে ভাষা দিয়েছে। কারণ যে দুঃখ বা সুখ সে আহরণ করেছে জীবনের চলার পথে তা তো কেবল তার একার অর্জন নয়- তা ধারণ করে অসংখ্যের উত্তরাধিকার। তাইতো একজন পুরুষ ঔপন্যাসিক বা গল্পকারের কলমে যখন নারী তার হৃদয়বেদনার ভাষারূপ খুঁজে পায় তখন গৌণ হয়ে যায় লেখক বা পাঠকের লৈঙ্গিক পরিচয়। কারণ সেই মুহূর্তে ওই দুঃখের অনুভূতিটুকু তাদের জুড়ে দেয় উপলব্ধির সম-ভূমিতে। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল বিংশ শতকের একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন। লিখেছেন অজস্র ছোটগল্প। চিকিৎসক জীবনের বিচিত্র বর্ণময় অভিজ্ঞতার সম্ভার গল্পগুলিতে সমকাল ও সমাজের অজস্র উপাদান সাজিয়ে দিয়েছে। আমরা বনফুলের কয়েকটি ছোটগল্প অবলম্বনে নারীর অবস্থানকে খুঁজে দেখব তাঁর গল্পবিশ্বে। সমাজ, তার শতাব্দী প্রাচীন অনুশাসন, তার সংকীর্ণতা বারবার স্তব্ধ করে দিতে যায় নারীর স্বতঃস্ফূর্ত জীবনপ্রবাহকে। কোন সেই নারী প্রতিবাদে ঝলসে ওঠে, কখনো বা পরিস্থিতির অনুশাসন রুদ্ধ করে দিতে চায় তার কণ্ঠস্বর। অ-বাধ্য নারীকে এই সমাজ ভয় পায়। বিংশ শতকের রক্ষণশীল সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী তার প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়নি।

পুরুষতন্ত্রের কড়া অনুশাসনে যে নারী পেরিয়ে এসেছে তার শৈশব, যার খেলার সামগ্রীটুকুও চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজ-স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে, সেই নারীর সময় লেগেছে সমাজের মুখোমুখি হতে। বিংশ শতক আসলে সেই সংগ্রামের প্রস্তুতিকাল। বনফুলের গল্পে আমরা খুঁজে দেখবো সেই প্রস্তুতির আখ্যান।

বিবাহকে কেন্দ্র করে নারীমনের সলজ্জ উচ্ছ্বাস ও সংসার সম্পর্কিত আনন্দঘন অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে 'অমলা' গল্পটিতে। বিবাহোপলক্ষে পাত্রপক্ষের আগমণ সংবাদের মধ্যে দিয়ে কাহিনির সূচনা। কল্পনাপ্রবণ সরলমতি অমলা, পাত্রের 'অরুণ' নামে মুগ্ধ হয়। লেখক বলছেন- "নাম শুনেই অমলার বুকটিতে যেন অরুণ আভা ছড়িয়ে গেল।"[১] সংসার- স্বপ্নে মশগুল অমলা অরুণের ভাই বরুণকে দেখে মনে মনেই তাকে 'ঠাকুর-পো'র স্নেহাসনে বসিয়ে দিল। এই পর্যন্ত কাহিনিটিতে বাংলাদেশের চিরকালীন কোমলস্বভাবা নারীমনটি খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। সংসার নামক এক সুখের স্বপ্ন আশৈশব যার যাপনের অঙ্গ। খেলাঘরের পাতানো সম্পর্কে কিম্বা হাতাখুন্তির অনভ্যস্ত সংঘর্ষে এই সংসার-বুদ্বুদের প্রথম সৃজন। অমলাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু পণপ্রথা নামক বাস্তব সামাজিক সমস্যাটি এই রোমাঞ্চকর স্বপ্ন-স্রোতস্বিনীর গতিধারাটির পথ আগলে দাঁড়ায়। লেখক জানালেন- "বিয়ে কিন্তু হল না- দরে বন্‌ল না!"[২] শতকীয় সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে, একটা প্রতিবাদী নারীস্বর আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি এহেন অপমান ও প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশ শতকের পল্লীবাঙলার স্থিতিশীল ভীরু জীবনপ্রবাহে তেমনটা কিন্তু ঘটেনি। সেদিনের সমাজে পণপ্রথা এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল সমাজমনে। ফলত পুনর্বার অপর একটি পাত্রপক্ষের মুখোমুখি হতে হল অমলাকে। আমাদের একুশ শতকের মন অবাক হয়ে দেখল, আবারো স্বপ্ন সাজিয়েছে সংসার-অভিলাষী অবাধ্য নারীমন। এবারে দরে বনলেও মেয়ে পছন্দ হল না। আবারো একুশ শতকের নারীমন অপমানে কুঁকড়ে ওঠে। কিন্তু অমলার নির্মল মনে তখনো সহস্র স্বপ্নের অবিরাম বুনন। শেষপর্যন্ত লাভ-ক্ষতির বাণিজ্যিক সাফল্যকে মর্যাদা দিয়ে অমলার একটি বিবাহ স্থির হয়। পাত্র সদাগর অফিসে কর্মরত, মোটা কালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট বিশ্বেশ্বরবাবু। শুভদৃষ্টির সময় অমলার হৃদয় এক প্রশান্ত মায়ায় ভরে উঠল। কাহিনির সমাপ্তি হয়েছে অমলার সুখী দাম্পত্যের বার্তায়। পণপ্রথার সামাজিক কুফল ও তার ভীতিপ্রদ পরিণাম আমাদের অজানা নয়, কিন্তু সমাজমনে তার এই স্বচ্ছন্দ অবস্থান কী অনায়াসে তুলে ধরেছেন লেখক! 'দর' শব্দের সচেতন ব্যবহার সমাজে নারীর নিরুপায় অবস্থানকে বুঝিয়ে দেয়। সমান্তরালে নারীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ও কল্পনাপ্রবণতার যুগপৎ মিলনে গল্পটি এক অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য লাভ করেছে।

পণপ্রথার করুণ পরিণতির অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে 'মায়া' গল্পটিতে। কাহিনির মূল উপজীব্য হল কন্যার বিয়ের দানসামগ্রীতে দরিদ্র পিতা রূপার বাসন দিতে না পারায়, শ্বশুরবাড়ির নিত্যদিনের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে অসহায় বধূর আত্মহত্যা। অথচ একটি মাত্র বাক্যে কাহিনির অন্তিমে এই বার্তাটি লেখক দিয়েছেন। ঘটনা হিসাবে এটি নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারী। কিন্তু হতভাগ্য ভারতবর্ষীয় সমাজে এমন ঘটনা একুশ শতকেও বিরল নয়। ফলত এই করুণ পরিণতি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের অপরিচিত বা অপ্রাত্যাশিত কোনটাই নয়। এই মৃত্যু আমাদের মনকে আর বিস্মিত করে না। কিন্তু এর পাশাপাশি একটা ভালোবাসার গল্পও লেখক নৈপুণ্যের সাথে তুলে ধরলেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে। কাহিনিতে আমরা পাই মণিময় চক্রবর্তীর কথা। পণপ্রথার বলি মায়ানাম্নী হতভাগ্য রমণীর স্বামী মণিময়। অত্যাচারিত স্ত্রীর জীবদ্দশায় তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি সেকথা বলাই বাহুল্য। অথচ স্ত্রী-কে তিনি ভালোবেসেছিলেন। কথক-ডাক্তারের বছর দশেক পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে তেমন ইঙ্গিতই মেলে। জ্বরের ঘোরে তিনি অনুভব করেন মৃতা স্ত্রীর উপস্থিতি। যে রৌপ্যবাসন স্ত্রীর জীবদ্দশায় সংগৃহীত হয়নি, সেই রূপোর গ্লাস হাতে তিনি দেখলেন অপেক্ষমান স্ত্রী মায়া-কে। যে প্রতিশ্রুতি দেয় রূপোর গ্লাসে ঝর্ণার স্ফটিকজলের। সেই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেননি মণিময়। রাত্রির

নিকষ আঁধারে উলঙ্গ মণিময় বেরিয়ে পড়েন পথে স্ত্রীর অনুসরণে। মৃতা স্ত্রীর আহ্বানে ভয়ের বদলে তাকে অনুসরণের অদম্য আগ্রহের মধ্যে দিয়ে স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালোবাসারই ইঙ্গিত মেলে। এই বিভ্রম তথা অলীক দর্শন স্পষ্টতই এক মানসিক ব্যাধির কথা বলে। স্ত্রী-র মৃত্যুতে যে মানসিক আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা মণিময়বাবুর অবচেতনায় সঞ্চিত ছিল প্রথমাবধি। জ্বরের সময় অপরাধবোধ জাত এই বিকার তথা বিভ্রমের চরম পরিণতি আমরা দেখতে পেলাম তাঁর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। অসহায়তা ও ভালোবাসার এই করুণ কাহিনিটি বনফুলের এক অনবদ্য নির্মাণ। আবেগের সংযমী প্রকাশ ও নির্মোহ বাহুল্যবর্জিত বিবরণ, গল্পটির আবেদন এক স্বতন্ত্র মাত্রায় পৌছে দিয়েছে।

বিবাহের মধ্যে দিয়ে নারী জীবনের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। আবাল্যের খেলাঘরের রঙিন স্বপ্নগুলো আস্তে আস্তে প্রতিফলিত হতে চায় প্রাত্যহিকতার আটপৌরে আয়োজনে। রক্ষণশীল ভারতীয় তথা বাঙালি গৃহস্থালিতে, সদ্য যৌবন স্পর্শ করা মেয়েটি অচিরেই একটা বৃহৎ পরিবারের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। পৃথিবী জোড়া প্রত্যাশা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে তার সীমিত অভিজ্ঞতার পৃথিবীকে। স্ত্রী, মা, পুত্রবধূ, বৌদি এমন অজস্র সম্পর্কের বহুমাত্রিক সমীকরণের ভিড়ে সে ভুলতে বসে তার ব্যক্তি আমি'র অস্তিত্ব। সমাজ বা পরিবারও অভ্যস্ত উদাসীনতায় উপেক্ষা করে যায় তার পরিশ্রম, ত্যাগ আর অভিযোজনের ক্ষমতাকে। তার নিরন্তর পরিসেবা গৃহীত হলেও ন্যূনতম স্বীকৃতি বধূটির প্রত্যাশাতীত। এই অসামান্য নারীদের কাহিনিই বনফুল তুলে ধরেন একটি নিমগাছের রূপকে। 'নিমগাছ' গল্পে দেখা যায়, ভেষজগুণসম্পন্ন এই গাছটির ফুল, পাতা, ছাল, ডাল সমস্তটাই ব্যবহৃত হয় মানুষের প্রয়োজনে। একাধিক রোগের উপশমে অব্যর্থ ওষুধ নিমের পাতা কিম্বা ছাল। এমনকি নিমগাছের হাওয়ার গুণও উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু বড় অযত্নে আবর্জনার মধ্যেই তার অবস্থান। যাবতীয় প্রতিকূলতার মধ্যেই সে শিকড় বিস্তার করে চলেছে পৃথিবীর গভীরে- আহরিত প্রাণসুধা বিলিয়ে চলেছে নিরন্তর। প্রত্যাশা বিহীন এ এক অসহ্য ক্লান্তিকর যাপন। এই পরিপার্শ্ব যেন শানবাঁধানো ফুটপাতের মতোই তার দম বন্ধ করে দিতে চায় ক্রমাগত। এই গাছের সামনেই একদিন মুগ্ধ চোখে এসে দাঁড়ায় এক কবি। ছাল-ডালের ব্যবহারিক উপযোগিতা বাদ দিয়ে সে দেখে পাতা ও ফুলের ভরাট সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে তার জীবনের উদযাপনকে। কোন এক বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটা'ও এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে আত্মসমর্পণ করতে চায়। নিমগাছটার মতোই শিকড় উপড়ে ফেলে সঙ্গী হতে চায় ওই মুগ্ধ দৃষ্টির। কিন্তু কর্তব্য, দায়িত্বের অজস্র প্রতিশ্রুতির শিকড়কে সে উপড়ে ফেলতে পারে না সমূলে। কারণ 'মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে'। তাই আবর্জনার স্তূপে, উপেক্ষার অন্ধকারেই সে বাঁধা পড়ে রইল চিরকালের মতন। পুরুষের কলমে নারীর আত্মত্যাগের এই মরমী আখ্যান আজকের পৃথিবীতেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। কালগত সুদীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও অবস্থানগত এই সাদৃশ্য, প্রগতিশীল সমাজে নারী-স্বাধীনতার অসংখ্য তত্ত্ব ও তর্কের মাঝেই নারীর অসহায়তার ছবিটিকেই তুলে ধরে স্পষ্ট করে।

'অদ্বিতীয়া' গল্পে হাস্যরস ও ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে যে কাহিনি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে নারীজীবনের অসহায়তার ছবিটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চার বছরের দাম্পত্যজীবনে দুইবার যমজ সন্তান সহ সর্বমোট ছয়টি সন্তান প্রসব করেও পুনর্বার গর্ভবতী প্রভাবতী। সেই উপলক্ষে গেছেন চিকিৎসক ভাইয়ের বাড়িতে। দিনকয়েক পর খবর আসে সন্তান প্রসবকালে 'একম্পসিয়া' হয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। শ্যালক আরো জানান মাতৃহীন শিশুরা তাদের সেজোমাসির কাছে রয়েছে। মাস দুয়েক পর শ্যালিকা সদ্য বিপত্নীক এই ব্যক্তিকে চিঠিতে জানান, 'এখানে একটি বেশ ডাগরডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয় বলো, সম্বন্ধ করি।' এই চিঠির প্রত্যুত্তরে ব্যক্তির বিবাহ-ব্যাকুলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিচিত কাউকে না জানালেও কাঁচা-পাকা গোঁফটি কেটে তিনি রওয়ানা দেন সম্বলপুরে দ্বিতীয় বিয়ের স্বপ্ন চোখে নিয়ে। সময়মতো বিবাহ সুসম্পন্নও

হয়। কিন্তু ফুলসজ্জার রাতে উন্মোচিত হয় প্রকৃত রহস্য। জানা যায়, সপ্তম সন্তান প্রসবকালে বধূটির অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে। কোনক্রমে প্রাণরক্ষা হওয়ায় বধূটি তার দিদিকে জানিয়েছিল, "আমি মলে ওঁর ভারি কষ্ট হবে।"[৩] স্বামীর প্রতি আস্থাশীল অবোধ বধূটির বাস্তববাদী সেজদিদি একশো টাকার বাজি ধরে সরলমতি ছোট বোনকে অচিরেই ভুল প্রমাণ করে দেন। স্বামীর অপদস্থতার মধ্যে দিয়েই কাহিনিটি সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু স্বল্পায়তন গল্পটি বেশ কয়েকটি সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে। প্রথমত, চার বছরের মধ্যে ছয়টি সন্তানপ্রসব অত্যন্ত অমানবিক ও অবৈজ্ঞানিক একটা প্রক্রিয়া। প্রভাবতীর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের খোঁজ কেউ রাখেনি। সন্তান জন্মদানে নারীর সচেতন সিদ্ধান্তগ্রহণের স্বাধীনতা হয়তো বিশ শতকের প্রভাবতীদের কাছেও হাসির উপাদান হতে পারতো। সংসারের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য সত্ত্বেও সে পেল স্বামীর উপেক্ষা। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদের দুই মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বিয়ের সলজ্জ সম্মতি, স্বামীর ভালোবাসার প্রকৃত স্বরূপকে বধূটির কাছে হয়তো তুলে ধরেছে। আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কল্পনা করতে বাসনা হয় প্রভাবতীর প্রতিবাদ, প্রত্যাখ্যান ও স্বনির্ভরতার আখ্যান। কিন্তু সেদিনের প্রভাবতী, দিদিকে শর্তের টাকা চুকিয়ে ফেলে আসা সংসারের হাল ধরবে পুনর্বার। তার শিকড় ছড়িয়ে যাবে সংসারের গভীর থেকে গভীরে। এই কাহিনি এক আশ্চর্য যন্ত্রণার 'বারোমাস্যা' হয়ে থেকে যায় আমাদের মনে।

'এপার ওপার' গল্পটিতে লেখক বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় অলকা ও সুষমা নাম্নী দুই নারীর ভিন্ন সামাজিক অবস্থানকে লেখক তুলে ধরেছেন অনবদ্য মুন্সিয়ানায়। অথচ লেখকের সহানুভূতির স্নিগ্ধ আলো যখন ছড়িয়ে পড়ল তাদের হৃদয়-গহীনে, সেখানে উপেক্ষিত নারীমনকে আমরা পেলাম একাকীত্বের নির্জনতায়। প্রসিদ্ধ বাইজি অলকা কিম্বা সুগৃহিনী সুষমা কাউকেই আর আলাদা করা যায় না। অনুষ্ঠানের আনন্দলোকে গজল-শিল্পী অলকাদেবীর বিপুল জনপ্রিয়তা। তাঁর কণ্ঠ শিহরণ জাগায় শ্রোতার প্রাণে। অন্তঃপুরিকাদের কাছে এই সাফল্য, খ্যাতি যেন রূপকথার এক আখ্যান। তাদের দীর্ঘশ্বাসে মিশে থাকে ঈর্ষা, মুগ্ধতা আর অবিশ্বাসের আলাপ। অথচ তারা জানতে পারে না, অলকাদেবীর উদযাপিত শিল্পী জীবনের বাইরে রয়েছে এক কোমল মাতৃহৃদয়। যে আঁকড়ে ধরতে চায় প্রতিবেশী শিশুকে মাতৃহৃদয়ের নিবিড় উষ্ণতায়। কিন্তু শিশুটির পরিবার যে এই ঘনিষ্ঠতা বিশেষ ভালো চোখে দেখে না, তেমন ইঙ্গিত মেলে কাহিনির স্বল্প পরিসরে। অলকাদেবীর মধ্যে আজো বেঁচে আছে এক সরল অনাড়ম্বর পল্লীবালা, যে প্রতিনিয়ত মনে মনে স্পর্শ করে তাঁর পরিজনদের, স্নেহের বুধি গাইকে। কিন্তু এই স্নেহকোমল নারীমন উপেক্ষিত হয় মদ, মাংস সহযোগে গজল উপভোগের উদ্দেশ্যে আগত কাপ্তেনের কাছে। কাহিনির অন্যপ্রান্তে আমরা পাই সুগৃহিনী সুষমাকে। দেবরের বিয়ের যাবতীয় শ্রমসাধ্য প্রস্তুতি মুখ্যত তার নমনীয় স্কন্ধেই। বিপুল কর্মসমুদ্রের মাঝে একঝলক দমকা বাতাসের মতন অলকাদেবীর উপস্থিতি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় তার বিবাহ-পূর্বের রূপকথার মতন দিনগুলিতে। ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছিলেন সুষমার বাবা। তার গান প্রশংসিত হয়েছে সর্বত্র। সভায় সমিতিতে গান গেয়ে বেড়িয়েছে সে। সেতার, এস্রাজ, ব্যাঞ্জো, বেহালায় তার অসামান্য দক্ষতায়, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্র তাঁকে মেডেলও দিয়েছেন। অথচ সংসারের বহুমুখী কর্মপ্রবাহে জর্জরিত সুষমা আজ কেবলই এক গৃহবধূ। যদিও এই গৃহিনীপনায় সে তার দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছে আন্তরিক কর্মনিষ্ঠায় কিন্তু তার শিল্পীসত্তা হারিয়ে যেতে বসেছে সংসার-অরণ্যে। স্পষ্টতই সমাজ- কাঠামোর দুই ভিন্ন বিন্দুতে অলকা ও সুষমার অবস্থিতি। কিন্তু দেখা গেল উদযাপিত শিল্পীজীবন কিম্বা চারদেওয়ালের সীমাবদ্ধ গৃহিণীজীবন নারীমন উপেক্ষিত হয়েছে সর্বত্র। গল্পের সীমিত পরিসরে, লেখকের দরদী মনের স্বাক্ষর হয়ে থেকে যাবে এই গল্পটি।

নারীর প্রতি সমাজের ভিন্নধর্মী নির্মম নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য বহন করে 'তিলোত্তমা' গল্পটি। তিল তিল করে যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য আহরণ করে গল্পের তিলোত্তমার নির্মাণ, সমাজ-নির্ধারিত সুন্দরের মানদণ্ডে তার স্থান নেই। সমাজ

ও পরিবারের চোখে তিলোত্তমা কুরূপা কিন্তু তার কর্মক্ষমতা ও সারল্য গোকুলের চোখ এড়ায় না। কিন্তু নাট্যশিল্পী কবি-প্রকৃতির গোকুল ভাবে "একটা চাকরানীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!"[৪] এদিকে প্রতিশ্রুত পণ আদায় না হওয়ার গোকুলের পরিবার তার দ্বিতীয় বিবাহে বদ্ধপরিকর। স্বয়ং গোকুলও দ্বিতীয় বিবাহে উৎসাহী জানা সত্ত্বেও তিলোত্তমা কখনো প্রতিবাদ করেনি। তার সমস্তটা দিন কাটে সাংসারিক কর্মময়তা আর অপমানের মধ্যিখানে। বিবিধ ঘটনা পরম্পরায় পরিশেষে গোকুলের সাথে রূপসী ঊষার বিবাহ স্থির হয় কল্পনাতীত পণের বিনিময়ে। সেই বিবাহ আয়োজনে তিলোত্তমার উপস্থিতি কাউকে বিচলিত বা ব্যথিত করে না। আশীর্বাদের সময়, শাঁখ বাজানো প্রয়োজনে ডাক পড়ে তিলোত্তমার। শাঁখ হাতে সে সসংকোচে এসে দাঁড়ায় স্বামীর বিবাহ-আয়োজনের মাঝে। এই নির্মমতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দুর্লক্ষ্য নয় মোটেও। রূপহীনতা বা কন্যাপণের অপর্যাপ্ততা কিম্বা সন্তানহীনতার মতো আপাত অসম্পূর্ণতা এমন নির্মমতা বারবার ক্ষতবিক্ষত করেছে নারীকে। কিন্তু গল্পে এই দৃশ্যের যন্ত্রণা গোকুল সহ্য করতে পারেনি। সে ঊষার সাথে বিবাহ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করে। কাহিনির তিলোত্তমা রক্ষা পায় কিন্তু বাস্তবের অজস্র তিলোত্তমা হারিয়ে যায় যন্ত্রণা আর একাকীত্বের অন্ধকারে।

ভারতবর্ষীয় সমাজে কন্যাসন্তান কোনদিনই বিশেষ আদৃত হয়নি। পুরুষ সন্তানের মধ্যেই পরিবার ও বংশের সার্থকতা খুঁজেছে সমাজ। ফলত কন্যাসন্তান দায় ব্যতীত আর কীই বা হতে পারে পরিবারের কাছে! তাই বিবাহকে কেন্দ্র করে পণপ্রথা নামক কদর্য সমাজ-স্বীকৃত চর্চাটি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ও পরিবারকে অবমাননা ও অত্যাচার ও শোষণের চরম সীমায় পৌছে দিয়েছে বারবার। অন্যদিকে সদ্য পরিণীতা অসহায় বধূর করুণ পরিণতি যুগে যুগে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে, ধিকৃত হয়েছে সামাজিক ব্যাধির ঘৃণ্য নিদর্শন হিসাবে কিন্তু একেবারে নির্মূল হয়ে যায়নি সমাজ থেকে। তাই কন্যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার রূপ, গাত্রবর্ণের মতোন মানদণ্ডগুলো জড়িয়ে যায় তার অস্তিত্ব ও পরিণতির সঙ্গে। 'সমাধান' গল্পে আমরা দেখতে পাই এক সাধারণ স্নেহশীল পিতৃহৃদয়কে- যে রূপ, গায়ের রঙকে মেয়ের নামকরণে প্রতিফলিত করতে চায়নি। কিন্তু স্ত্রী বা পরিবার কালো, কুরূপা কন্যার 'বুঁচি' ব্যতীত অন্য কোন নাম কল্পনা করতে পারেনি। খানিক দ্বন্দ্বে ভুগে পিতাও মোটামুটি মেনেই নিয়েছিলেন মুখ দিয়ে ক্রমাগত লাল-ঝরা বোকাহাবা মেয়ের তাচ্ছিল্যের নামকরণকে। বুঁচির মা-ও যে মেয়ের উপর ষোলোআনা প্রসন্ন ছিলেন, তেমনটাও হয়ত না। কারণ কুরূপা, বোকাহাবা সন্তানপ্রসব মায়ের দুর্বলতা হিসেবেই তো চিরকাল সমাজস্বীকৃত। এহেন বুঁচি, যার বয়স সবেমাত্র এক বছর, তার বিবাহ প্রসঙ্গ ওঠে চণ্ডীমণ্ডপের বিশেষজ্ঞদের মজলিসে। কন্যাবিবাহে আজকাল রূপ ও অর্থের যৌথ উপস্থিতির অনিবার্যতায় যখন সভা মোটামুটি একমত, এমন সময় পিওনের চিঠি জানিয়ে যায়- 'বুঁচি মারা গেছে কাল'। গল্পের এই অন্তিম পংক্তিটি যেন চাবুকের মতন আছড়ে পড়ে এই সমাজের মুখে। বুঁচির জীবনে, মৃত্যু অপেক্ষা সহজ সমাধান আর কী ই বা হতে পারতো! এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে 'খেঁদি' নামক অপর একটি সংক্ষিপ্ত গল্প। স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্যের ছবি দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত। জ্যোতিষবিদ্যায় আস্থাশীল স্বামী বিশ্বাস করেন তাঁর স্ত্রী কন্যাসন্তানই প্রসব করবেন। অনাগত কন্যাকে নিয়ে তাঁর অজস্র রঙীন স্বপ্ন। অনেক ভেবে তিনি ঠিক করেন "ইংরিজি key মানে চাবি আর বাঙলা 'কি' একটা প্রশ্ন- মেয়েমানুষের পক্ষে বেশ মানানসই নাম হবে।"[৫] তিন জনের এক স্বপ্নময় পৃথিবী তৈরি হওয়ার আগেই ঘটে গেল ভাগ্যবিপর্যয়। মালতীর সন্তানপ্রসবের মাস দুই পূর্বে কলেরায় তার স্বামীর মৃত্যু হল। আর সন্তানপ্রসব করতে গিয়ে মালতীও মারা যায়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তাদের বহু কাঙ্ক্ষিত কন্যাসন্তান মামাবাড়িতে পালিত হতে থাকে খেঁদি নামে। কাহিনিটির করুণ পরিণতি আমাদের নির্বাক করে দেয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর পূর্ণতা খোঁজে তাঁর মাতৃত্বের মধ্যে দিয়ে। একক নারীর স্ব-নির্ভর স্বাধীন যাপনকে আজকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগেও এই পৃথিবী ভয়ের চোখে দেখে। স্বামী, সন্তান সম্বলিত পারিবারিক যৌথ যাপনকে স্বীকৃতি দিতে এই সমাজের দ্বিধা নেই। কিন্তু সন্তানহীনা নারীর সংগ্রাম ততখানি সহজ হয় না। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের বিবিধ আচার অনুষ্ঠানে সন্তানবতী নারীদের অতিরিক্ত প্রাধান্য এই কদর্যতাকে আরো স্পষ্ট করে দেয় আজো। ফেলে আসা শতকের গৃহস্থের অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যাবে এই বৈষম্য ও অপমানের আরো মর্মান্তিক বিবরণ। 'ভিতর ও বাহির' গল্পে দেখা যায় উকিল রামকিশোরবাবুর আইনি পরামর্শ তাঁর কন্যার দাম্পত্যজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। কন্যা সরোজিনী সন্তানহীনা ফলত শ্বশুরবাড়িতে অপমান ও গঞ্জনা তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তারা পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহের মধ্যে দিয়ে বংশরক্ষায় আগ্রহী। অপরিচিত লোক মারফত বত্রিশ টাকার ফী দিয়ে তারা সরোজিনীর উকিল পিতার পরামর্শ নিয়ে গেছে এই বিষয়ে। পেশাদার রামকিশোরবাবু জানিয়েছেন যেহেতু বধূটির সন্তানধারণে অক্ষমতা ডাক্তার-স্বীকৃত এবং স্বামীটি 'স্বাস্থ্যবান' তাই তিনি দ্বিতীয় বিবাহের পরামর্শ দেন। এই বিয়ে যে হিন্দু বিবাহ আইন অনুমোদিত, সে বিষয়টিও তিনি স্পষ্ট করে দেন। তিনি আরো বলেন– "বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার ত শ্মশান।"[৬] আইনি বিশেষজ্ঞের এই অভিজ্ঞ পরামর্শের পর বরপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আর বিশেষ দেরী করেনি। ফলত বিতাড়িত সরোজিনী এসে দাঁড়িয়েছে রামকিশোরের মুখোমুখি। পেশাদার উকিল রামিকিশোর তখন শুধুই একজন নির্বাক পিতা যিনি স্বহস্তে কন্যার বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছেন। এই অসংবেদনশীল পরামর্শ প্রদানকালে, অপরিচিত মেয়েটি, যার সঙ্গে তাঁর নিজ কন্যার অবস্থাগত সাদৃশ্য রয়েছে, তার কথা একবারের জন্যও ভেবে দেখেননি। যদি ভাবতেন পরিণতি খানিকটা ভিন্ন হতে পারতো। আসলে পেশাদারিত্ব মানে মানবিকতাবিহীন বা সংবেদনশীলতা বিবর্জিত বাণিজ্যিক সাফল্য নয়। সহৃদয়তাও তার আবশ্যিক শর্ত। রামকিশোরবাবুর মতন মানুষেরা এইভাবেই সমাজকে কঠিন রক্ষণশীলতায় বেঁধে চলেছেন অবিরত।

বনফুলের গল্পের এই নারীরা কেউই আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। পরিপার্শ্ব থেকেই তারা উঠে এসেছে কাহিনির অন্দরমহলে। চিকিৎসক জীবনের বর্ণময় অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন মনুষ্য হৃদয়ের নগ্ন চেহারা, তার কামনা বাসনার বিকৃতি আর কখনো বা প্রবৃত্তির কাছে তার অসহায় আত্মসমর্পণ। গল্পগুলির নিবিড় পাঠে তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় পাঠকের কাছে গোপন থাকে না। যে নারী সমাজ তথা পরিবারের নির্মম নিষ্পেষণে প্রতিনিয়ত ধ্বস্ত হয়, ক্লান্ত হয় সংসার নামক গোলকধাঁধায় মুক্তির পথ খুঁজে বনফুলের মরমী কলম তাদের কথা বলে। বিশ শতকের রক্ষণশীল বাঙালি সমাজের অন্তঃপুরিকাদের যাপনকথা উঠে এল তাঁর গল্পে। তবে তাঁর বলবার একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিটি সম্পূর্ণ অভিনব। অনাড়ম্বর যুক্তিনিষ্ঠ নির্মেদ গদ্য বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন। চিকিৎসক হওয়ার দরুণ তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি প্রাচুর্যে আর বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। আজ এতগুলো দশক পেরিয়ে এসেও তাঁর গল্পের চরিত্ররা এতটুকু প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। একুশ শতকের বিশ্বায়িত পৃথিবীতে নারীর অবস্থান অনেকখানি বদলেছে। সমাজ ও পরিবারকে অতিক্রম করে তার নিজস্ব স্বর পৌছেছে বিশ্বের দরবারে। নারীর স্বাধীনতা, মুক্তি বা তার যৌনতার মতন বিষয়গুলি চর্চিত হয়েছে যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে। এই বিজয়যাত্রায় এই শতকের নারীকে পথ দেখিয়েছে ফেলে আসা শতকের অভিজ্ঞান। তাঁর গল্পের মেয়েরা প্রতিবাদে, প্রতিস্পর্ধায় হয়তো পুরুষতন্ত্রের ভিত্তিমূল টলিয়ে দিতে পারেনি কিন্তু অমলা, প্রভাবতী, সুষমা বা সরোজিনীর মতন মেয়েদের টিকে থাকার লড়াইয়ের মাঝেই নিরন্তর স্পর্ধা খুঁজে পায় এই শতকের বীরাঙ্গনারা।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। বনফুলের গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৮, পৃ. ৪।
২. তদেব, পৃ. ৪।
৩. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। বনফুলের গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৮, পৃ. ১৫।
৪. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। বনফুলের গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৮, পৃ. ৩৪১
৫. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। বনফুলের গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৮, পৃ. ৫।
৬. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ। বনফুলের গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৮, পৃ. ৫৭।